RUDIMENTS OF KNOWLEDGE

BY

ESHWAR CHANDRA VIDYASAGAR.

SECOND EDITION

CALCUTTA.

PRINTED AT THE SANSKRIT PRESS.

1852.

বোধোদয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

কলিকাতা।

সংস্কৃতযন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯০৮।

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

বোধোদয় নানা ইঙ্গরেজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইল; পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। যে কয়েকটী বিষয় লিখিত হইল বোধ করি তৎপাঠে, অমূলক কল্পিত গল্প পাঠ অপেক্ষা, অনেক উপকার দর্শিতে পারিবেক। অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি বালক বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে, এই আশয়ে অতিসরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছি; কিন্তু কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে অগত্যা যে যে অপ্রচলিত দুরূহ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে পুস্তকের শেষে সেই সকল শব্দের অর্থ লিখিত হইল। এক্ষণে বোধোদয় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইলে, শ্রম সকল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা।
২০এ চৈত্র। সংবৎ ১৯০৭।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

বোধোদয় প্রথম বার যেরূপ মুদ্রিত হইয়াছিল প্রায় তাহাই রহিল। কেবল কোন কোন স্থানে ভাষার কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করা গিয়াছে, যে যে স্থানে ভুল ছিল সংশোধিত হইয়াছে আর সুসংলগ্ন করিবার নিমিত্ত কয়েকটী প্রকরণের ক্রম বিপর্য্যয় করা গিয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা।
১৯এ ফাল্গুন। সংবৎ ১৯০৮।

সূচীপত্র।

বোধোদয়।

ঈশ্বর ও ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ।

আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই সে সমুদায়কে পদার্থ কহে। পদার্থ তিন প্রকার চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ। যে সকল বস্তুর জীবন আছে এবং যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে তাহারাই চেতন পদার্থ; যেমন মনুষ্য, গো, অশ্ব, পক্ষী, পতঙ্গ, কীট ইত্যাদি। যে সকল বস্তুর জীবন নাই আর যেখানে রাখ সেই খানেই থাকে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না তাহাদিগকে অচেতন পদার্থ কহে; যেমন ধাতু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, ঘটী, বাটী, দোয়াত, কলম, পুস্তক, কাচ ইত্যাদি। আর যে সকল বস্তু

ভূমিতে জন্মে তাহারা উদ্ভিদ পদার্থ; যথা তরু, লতা, গুল্ম, তৃণপ্রভৃতি।

ঈশ্বর সকল পদার্থেরই সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই প্রথমে চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, সমুদ্র, পর্ব্বত, তরু, লতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই তাঁহার সৃষ্টি। এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা কহে।

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। আমরা যাহা করি তিনি তাহা দেখিতে পান; যাহা মনে ভাবি তাহাও জানিতে পারেন। ঈশ্বর পরম দয়ালু। তিনি যাবতীয় জীব জন্তুকে আহার দেন ও রক্ষা করেন। অতএব ঈশ্বরকে ভক্তি, স্তব ও প্রণাম করা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

চেতন পদার্থ।

সমুদায় চেতন পদার্থের সাধারণ নাম জন্তু। জন্তুগণ মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ এবং মুখ দ্বারা আহার গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করে। আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি হয়, তাহাতেই বাঁচিয়া থাকে। আহার না পাইলে শরীর শুষ্ক হইতে থাকে এবং ত্বরায় মরিয়া যায়। প্রায় সকল জন্তুরই পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে, সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন ও স্পর্শ করিতে পারে।

পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না; নাসিকা আছে গন্ধ পায় না; মুখ আছে খেতে পারে না; হস্ত আছে কোন বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না; কর্ণ আছে কিছুই শুনিতে পায় না; পা আছে চলিতে পারে না। ইহার কারণ এই, পুত্তলিকা অচেতন পদার্থ, তাহার জীবন নাই। ঈশ্বর [illegible] জন্তুদিগকেই জীবন দিয়াছেন। তিনি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিরই জীবন দিবার শক্তি নাই। দেখ, মনুষ্যেরা পুত্তলিকার মুখ, চোখ,

নাক, কান, হাত, পা, সমুদায় গড়িতে পারে ও উহাকে ইচ্ছামত বেশ ভূষাও পরাইতে পারে; কিন্তু জীবন দিতে পারে না। উহা কেবল অচেতন পদার্থই থাকে, দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না, চলিতেও পারে না, বলিতেও পারে না।

পৃথিবীর সকল স্থানেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার জন্তু আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি স্থলচর অর্থাৎ কেবল স্থলে থাকে। কতকগুলি জলচর অর্থাৎ কেবল জলে থাকে। আর কতকগুলি স্থল ও জল উভয় স্থানেই থাকে, তাহাদিগকে উভচর বলা যাইতে পারে। যাবতীয় জন্তুর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বপ্রধান; আর সমুদায় জন্তু তদপেক্ষায় নিকৃষ্ট; তাহারা কোন ক্রমেই বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে মনুষ্যের তুল্য নহে।

যে সকল জন্তুর শরীরে চর্ম্ম রোমশ অর্থাৎ রোমে আবৃত, এবং যাহারা চারি পায় চলে, তাহাদিগকে পশু কহে। গো, অশ্ব, গর্দ্দভ, [illegible] মেষ, কুকুর, বিরাল ইহারা ও এইরূপ অন্য অন্য জন্তু পশুশ্রেণীতে গণ্য। পশুর চারি পা এই নিমিত্ত

ইহাদিগকে চতুষ্পদ কহা যায়। কোন কোন পশুর খুর অখণ্ডিত অর্থাৎ জোড়া; যেমন ঘোড়ার। কতকগুলির খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত; যেমন গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতির। কোন কোন পশুর পায়ে খুরের পরিবর্ত্তে নখর আছে; যথা বিড়াল, কুকুর, ব্যাঘ্র প্রভৃতির। কোন কোন পশুর রোম অনেক কাজে লাগে। মেষের লোমে কম্বল, বনাত প্রভৃতি প্রস্তুত হয়; তিব্বত দেশীয় ছাগলের লোমে শাল হয়।

জন্তুর মধ্যে পক্ষিজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ পালকে ঢাকা। দুই পাশে দুইটী পক্ষ অর্থাৎ ডানা আছে; তদ্দ্বারা উড়িতে পারে, অনেক দূর গেলেও ক্লেশ বোধ হয় না। উহাদিগের দুটী পা আছে তাহার দ্বারা চলিতে পারে এবং বৃক্ষের শাখায় বসিতে পারে। কোন কোন পক্ষী অত্যন্ত ক্ষুদ্র; যেমন চড়ুই, বাবুই ইত্যাদি। ইহারা খড়, কুটা, তুলা প্রভৃতি আহরণ করিয়া অতি পরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা নির্ম্মাণ করে। কাক, কোকিল, পায়রা প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষির আকার কিছু বৃহৎ।

হংস, সারস প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষী জলে খেলা করে ও সাঁতার দিতে ভাল বাসে। ইহারা জলচর পক্ষী। সকল পক্ষী আপন আপন বাসায় ডিম পাড়ে এবং কিছু দিন ডানায় ঢাকিয়া গরমে রাখিলে ডিমের ভিতর হইতে ছানা বাহির হয়। ইহাকেই ডিমে তা দেওয়া ও ডিম ফুটান কহে।

মৎস্য এক প্রকার জন্তু। ইহারা কেবল জলে থাকে। ইহাদের শরীর ছালে আচ্ছাদিত; ঐ ছালের উপর মসৃণ চিক্কণ শল্ক অর্থাৎ আঁইস আছে। সোয়াল মাগুর প্রভৃতি কতকগুলি মৎস্যের ছালে শল্ক নাই। মৎস্যের দুই পাশে যে পাখনা আছে তাহার বলেই জলে ভাসে। মৎস্যেরা অতিবেগে সাঁতার দিতে পারে; এবং জলের ভিতর দিয়া গিয়া কীট ও অন্য অন্য ভক্ষ্য বস্তু ধরে। তিমি নামে এক প্রকার মৎস্য আছে তাহার আকার অতি বৃহৎ; মানুষের অপেক্ষা অনেক বড়। কখন কখন দীর্ঘে ৫৬ হাত ও প্রস্থে প্রায় ১০ হাত তিমি দেখা গিয়াছে।

আর এক প্রকার জন্তু আছে তাহাদিগকে সরীসৃপ কহে। কতকগুলি সরীসৃপের পা নাই,

বুকে হাঁটে; কতকগুলির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে, তদ্দারা চলে। সর্প এক প্রকার সরীসৃপ। সর্পের পা নাই, বুকে ভর দিয়া ভূতলে বক্র গমন করে। সর্পের শরীরের চর্ম্ম অতি মসৃণ ও চিক্কণ। ভেক, কচ্ছপ, গোসাপ, টিক্‌টিকী প্রভৃতি কতকগুলি সরীসৃপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে, তদ্দারা তাহারা চলিতে পারে। ভেক জাতি অতি নিরীহ। কৌতুক ও আমোদের নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্লেশ দেওয়া উচিত নহে। কেহ কেহ এমত নিষ্ঠুর, যে, ভেক দেখিলেই ঢেলা মারে ও যষ্টি প্রহার করে।

পতঙ্গ জাতি এক প্রকার জন্তু। পতঙ্গ নানা বিধ। গ্রীষ্ম ও বর্ষা কালে ফড়িঙ্, মশা, মাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি বহুবিধ পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায়। কোন কোন পতঙ্গ জাতি সময় বিশেষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠে। পতঙ্গগণ পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি জন্তুর আহার।

কীট অতি ক্ষুদ্র জন্তু। কীট নানাপ্রকার। উকুন, মৎকুণ, পিপীলিকা, উই, ঘুণ প্রভৃতি ক্ষুদ্র জন্তু কীটজাতি।

এ সমস্ত ভিন্ন আরও নানাপ্রকার জন্তু আছে। উহারা এমত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ ব্যতিরেকে কেবল চক্ষুতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে জলে ও স্থলে অবস্থিতি করে। সমুদায় জগৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রাণিসমূহে পরিবৃত। অবশ্যই কোন না কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে সমুদায় প্রাণী সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সেই প্রয়োজন কি, অনেক স্থলেই তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

জগতে কত জীব জন্তু আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার কি অপার মহিমা! তিনি তাহাদিগের প্রতিদিনের অপর্য্যাপ্ত আহার যোজনা করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদিগের অধিকাংশই লতা, পাতা, ফল, মূল ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করে। কতকগুলি জন্তু আপন অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল জন্তু ধরিয়া তাহাদের প্রাণ বধ করিয়া ভক্ষণ করে।

সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় চতুষ্পদ জন্তু শ্বাপদ অর্থাৎ শিকারী জন্তু। ইহারা মৃগ, মেষ প্রভৃতি দুর্ব্বল জন্তু বধ করিয়া

মাংস ভক্ষণ করে। অশ্ব, গো, গর্দ্দভ, কুকুর, বিড়াল আদি কতকগুলি জন্তু মনুষ্যের অধীন থাকিতে অধিক রত এবং মানুষে যাহা দেয় তাহাই আহার করে। এই সকল জন্তুকে গ্রাম্য পশু বলে। ইহারা অতি নম্রস্বভাব; আমাদিগের অনেক উপকারে আইসে; এই নিমিত্ত ইহাদিগের উপর দয়া রাখা উচিত।

কোন্ জন্তু কোন্ শ্রেণীভুক্ত, কাহার কি নাম, এবং কে কোন্ জাতীয়, বিশেষ রূপে জানা অতি আবশ্যক। কোন পশুকেই অন্যথানামে ডাকা উচিত নহে; যার যে নাম, তাকে সেই নামেই ডাকা কর্ত্তব্য। কোন কোন ব্যক্তি ফড়িঙ্কে পশু কহে; কিন্তু ফড়িঙ পশু নয়, পতঙ্গ। যে সকল জন্তুর চারি পা তাহাদিগকে চতুষ্পদ কহে। পক্ষী চতুষ্পদ নহে কারণ উহার দুটী বই পা নয়; অতএব উহাকে চতুষ্পদ না কহিয়া দ্বিপদ কহা উচিত।

কোন্ জন্তুর কি প্রকৃতি ও ঈশ্বর কি অভিপ্রায়ে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহা সবিশেষ অবগত নহি। এই নিমিত্ত কতকগুলিকে পবিত্র,

পূজ্য, ও আদরণীয় জ্ঞান করি ; কতক গুলিকে ঘৃণা করি ও স্পর্শ করি না। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অন্যায় ও ভ্রান্তিমূলক। বিশ্বকর্ত্তা ঈশ্বরের সন্নিধানে সকল জন্তুই সমান ; অতএব আমাদিগেরও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত।

পশুদিগের মধ্যে পদমর্য্যাদা নাই। সিংহকে মৃগেন্দ্র অর্থাৎ পশুর রাজা কহে ; কিন্তু তাহা কদাচ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। সকল পশু অপেক্ষা সিংহের পরাক্রম অধিক, এই নিমিত্ত মনুষ্যেরা তাহাকে ঐ নাম দিয়াছে। নচেৎ সিংহ অন্য অন্য পশু অপেক্ষা কোন মতে উত্তম নহে।

মানব জাতি

মনুষ্যজাতি বুদ্ধি ও পরাক্রমে সকল জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; তাহাদিগের বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি আছে ; এজন্য পশু পক্ষী ও অন্য অন্য সর্ব্বপ্রকার জীব জন্তুর উপর আধিপত্য করিতে পারে। মনুষ্য পশুর ন্যায় চারি পায় চলে না ; দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায় ; তাহাদের হস্ত ও অঙ্গুলি সহিত, দুই বাহু আছে ; ঐ হস্ত ও অঙ্গুলি দ্বারা তাহারা ইচ্ছানুরূপ সকল কর্ম্ম করিতে পারে। অন্য অন্য জন্তুর শরীরের চর্ম্ম রোমশ ; এ জন্য তাহারা শীতে ও বাতাসে ক্লেশ পায় না। কিন্তু মানুষের চর্ম্ম রোমশ নহে ; সুতরাং শীত বাত বারণের নিমিত্ত আবরণ বস্ত্র আবশ্যক। ঈশ্বর মনুষ্যকে হস্ত দিয়াছেন ; উহা দ্বারা তাহারা বস্ত্র, গৃহ, গৃহসামগ্রী ও অন্য অন্য আবশ্যক বস্তু প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে ; এবং রন্ধন

ও শীত নিবারণের নিমিত্ত অগ্নিও জ্বালিতে পারে।

মনুষ্য জাতি একাকী থাকিতে ভাল বাসে না। তাহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারের মধ্যগত ও প্রতিবেশি মণ্ডলে বেষ্টিত হইয়া বাস করে। এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন ব্যক্তি লোক-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে; কিন্তু তাদৃশ লোক অতিবিরল। অধিকাংশ লোকই গ্রামে ও নগরে পরস্পরের নিকট বাটী নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করে। যে স্থানে অল্প লোক বাস করে, তাহার নাম গ্রাম। যেখানে বহুসংখ্যক লোকের বাস, তাহাকে নগর কহে। যে নগরে রাজার বাস, অথবা রাজকীয় প্রধান স্থান থাকে, তাহাকে রাজধানী কহে; যেমন কলিকাতা বাঙ্গলা দেশের রাজধানী।

মনুষ্যেরা গ্রামে ও নগরে একত্র হইয়া বাস করে। ইহার তাৎপর্য্য এই; তাহাদের পরস্পর সাহায্য ও আনুকূল্য হইতে পারিবেক;

এবং পরস্পর দেখা শুনা ও কথা বার্ত্তায় সুখে কাল যাপন হইবেক। যে লোক যে দেশে বাস করে তাহাকে সেই দেশের নিবাসী কহে; এবং সেই সমস্ত নিবাসী লোক লইয়া এক জাতি হয়। পৃথিবীতে নানা দেশ ও নানা জাতি আছে।

লোক মাত্রেরি জন্মভূমি ঘটিত এক এক উপাধি থাকে; ঐ উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে অন্য দেশীয় লোক হইতে পৃথক বলিয়া জানা যায়। বাঙ্গালা দেশে আমাদের নিবাস, এই নিমিত্ত আমাদিগকে বাঙ্গালি বলে। এইরূপ উড়িষ্যা দেশের নিবাসি লোকদিগকে উড়িয়া কহে; মিথিলার নিবাসিদিগকে মৈথিল; ইংলণ্ডের নিবাসিদিগকে ইংরেজ।

মনুষ্যের দুইহাত; একটী ডানি, একটী বাম। আমরা যে হস্তে লিখি ও আহার করি সেই ডানি হাত; তদ্ভিন্নটী বাম হাত। বাম হস্ত অপেক্ষা দক্ষিণ হস্তে অনেক কর্ম্ম করা যায়। এইরূপ ডানিপা, বাঁ পা; ডানি চক্ষু, বাম চক্ষু; ডানি পাশ, বাঁ পাশ।

জন্তু সকল যখন শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয় তখন

তাহারা আরাম করে ও নিদ্রা যায়। নিদ্রা যাই-বার সময় তাহারা শয়ন ও নয়ন মুদ্রিত করে; অশ্ব প্রভৃতি কতক গুলি জন্তু দাঁড়িয়া নিদ্রা যায়। শশ প্রভৃতি কতক গুলি চক্ষু না বুজিয়া নিদ্রা যাইতে পারে। নিদ্রার প্রকৃত সময় রাত্রি; ঐ সময়ে সমস্ত জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। আমরা নিদ্রা যাইবার সময় কখন কখন স্বপ্ন দেখি; স্বপ্ন সকল কেবল অমূলক চিন্তা মাত্র; কোন কার্য্যকারক নহে। জন্তু সকল যখন নিদ্রা যায় তখন তাহারা নিদ্রিত; আর যখন নিদ্রা না যাইয়া জাগিয়া থাকে তখন তাহারা জাগরিত।

মনুষ্য ভিন্ন সকল জন্তুই কাঁচা বস্তু ভক্ষণ করে; ছাগ, মেষ, গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তু মাঠের কাঁচা ঘাস খায়। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপ-দেরা কোন জন্তু মারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কাঁচা মাংস খাইয়া ফেলে। পক্ষিগণও জীয়ন্ত কীট পতঙ্গ ধরিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করে। মনুষ্যেরা কাঁচা বস্তু খায় না; খাইলে পরিপাক হয় না, পীড়াদায়ক হয়। কিন্তু কতকগুলি পক্ক ফল

মূল ভক্ষণ করিতে পারে; ভক্ষণ করিলেও পীড়াদায়ক হয় না। তাহারা প্রায় সকল বস্তুই অগ্নিতে পাক করিয়া খায়। ভক্ষ্য বস্তু ভাল পাক করা হইলে সুস্বাদ ও শরীরের পুষ্টিকর হয়।

জন্তুগণ যখন সচ্ছন্দ শরীরে আহার বিহার করিয়া বেড়ায় তখন তাহাদিগকে সুস্থ বলা যায়। আর যখন তাহাদের পীড়া হয়, সচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে পারে না, সর্ব্বদা শুইয়া থাকে, সে সময়ে তাহাদিগকে অসুস্থ বলে। মনুষ্যের পীড়া হইবার অধিক সম্ভাবনা। পীড়া হইলে চিকিৎসকেরা ঔষধ দিয়া আরোগ্য করেন। অতএব পীড়িত হইলে বৈদ্যেরা যে ঔষধ দেন তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। রোগ হইলে ঔষধ ভিন্ন সুস্থ হইবার আর উপায় নাই। অনেকে ঔষধে অবহেলা করিয়া মরিয়া গিয়াছে।

কোন কোন জন্তু অধিক কাল বাঁচে; কোন কোন জন্তু অতি অল্প কাল মাত্র। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, কুকুর প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর বাঁচে। কোন কোন ঘোড়া প্রায় কুড়ি বৎসর বাঁচে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষি সকল কেবল কয়েক

বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকে। অধিকাংশ কীট পতঙ্গ প্রায় এক বৎসরের অধিক বাঁচে না। কোন কোন কীট এক ঘণ্টা মাত্র বাঁচে। অতি ক্ষুদ্র জাতীয় মশা সূর্য্যের আলোকে অল্প কাল মাত্র খেলা করিয়া ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

সকল জন্তুরই স্ত্রী ও পুরুষ আছে; এবং তাহাদিগের সন্তানেরা ঐ রূপ স্ত্রী ও পুরুষ হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে তাহারা সন্তান দিগকে রাখিয়া যায়। ঐ সন্তানেরাও ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া আপন আপন সন্তান রাখিয়া লোক যাত্রা সম্বরণ করে। এই রূপে এক পুরুষ গত ও আর এক পুরুষ আগত হয়। মনুষ্যজাতি অন্য অন্য প্রায় সমুদায় জন্তু অপেক্ষা অধিক কাল বাঁচে।

মরণের অবধারিত কাল নাই; অনেকে প্রায় ষাটি বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায় যাহারা সত্তর, আশী, নব্বই অথবা এক শত বৎসর বাঁচে তাহাদিগকে লোক দীর্ঘজীবী বলে, কিন্তু অনেকেই শৈশব কালে কালগ্রাসে পতি

হয়। এক্ষণে যাহারা নিতান্ত শিশু আছে তাহারাও তাহাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহীর ন্যায় বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে; কিন্তু চিরজীবী হইবে না। কেহই অমর নহে; সকলকেই মরিতে হইবেক।

জন্তু সকল মরিলে তাহাদের শরীরে প্রাণ ও চেতনা থাকে না। তখন উহারা আর পূর্ব্বের মত দেখিতে, শুনিতে, চলিতে, বলিতে কিছুই পারে না; কেবল অচেতন স্পন্দহীন জড় পদার্থ মাত্র পড়িয়া থাকে। মৃত শরীর বিশ্রী বিবর্ণ হইয়া যায়; দেখিলে অত্যন্ত অসন্তোষ জন্মে; এই জন্যে লোকে অবিলম্বে তাহা দাহ করে। কোন কোন জাতি দাহ করে না, মাটিতে পুতিয়া ফেলে।

মনুষ্য শৈশব কালে অতি অজ্ঞ থাকে; পরে, ক্রমে ক্রমে যত বড় হয়, উপদেশ পাইয়া নানা বিষয় শিখিতে থাকে। আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, ইহা কত বড় ও ইহার কেমন আকার, শিশুরা তাহার কিছুই জানে না। তাহারা মনে করে পৃথিবী মেজের

মত সমান ভূমি; কিন্তু ক্রমে পুস্তক পাঠ ও গুরূপদেশ দ্বারা জানিতে পারে পৃথিবী কমলা লেবুর ন্যায় গোল। শিখাইয়া না দিলে, শিশুরা কিছুই জানিতে পারে না; অধিক কি, তাহাদের কি নাম, কোন হাত ডানি, কোন হাত বাঁ, ইহাও জানিতে পারে না।

বালকেরা সকল বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া তাহাদিগকে শিক্ষার্থে পাঠশালায় পাঠান যায়। যাহারা বাল্যকালে যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যা অভ্যাস করে তাহারা চিরদিন ধনে, মানে, মনের সুখে কাল যাপন করে। আর যাহারা বিদ্যাভ্যাসে ঔদাস্য ও অবহেলা করিয়া কেবল খেলা করিয়া বেড়ায় তাহারা মূর্খ হয় ও যাবৎ জীবন দুঃখ পায়।

ইন্দ্রিয়।

ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার স্বরূপ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান জন্মে। ইন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা কোন বিষয়ে কিছু মাত্র জানিতে পারিতাম না। মনুষ্যের পাঁচ ইন্দ্রিয়। সেই পাঁচ ইন্দ্রিয় এই; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। চক্ষু দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে দর্শন কহে; কর্ণ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে শ্রবণ; নাসিকা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে ঘ্রাণ; জিহ্বা দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে আস্বাদন; ত্বক্ দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে স্পর্শ কহে।

চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা সকল বস্তু দর্শন করা যায়। চক্ষু না থাকিলে, কোন্ বস্তুর কেমন আকার, কোন্ বস্তু শাদা, কোন্ বস্তু কাল, কিছুই জানিতে পারিতাম না। যে স্থানে আলো থাকে সেই খানেই চোখে দেখা যায়; যে স্থানে গাঢ় অন্ধকার, কিছুই আলো নাই, সেখানে কিছুই দেখা যায় না। রাত্রিকালে

চন্দ্র ও নক্ষত্র দ্বারা অতি অল্প আলোক হয়, এই নিমিত্ত বড় স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না। দিনের বেলায় সূর্য্যের আলোক থাকে অতএব অতি সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়; রাত্রিতেও প্রদীপ জ্বালিলে বিলক্ষণ আলো হয়, তখন উত্তম দেখিতে পাওয়া যায়।

চক্ষু অতি কোমল পদার্থ, অল্পেই নষ্ট হইতে পারে; এজন্য চক্ষুর উপর দুই খানি আবরণ আছে। ঐ দুই আবরণকে চক্ষুর পাতা কহে। চক্ষুতে আঘাত লাগিবার, অথবা কিছু পড়িবার, আশঙ্কা হইলেই আমরা উহা দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া ফেলি। নিদ্রার সময় চক্ষের পাতা বন্ধ করা থাকে। চক্ষের পাতার ধারে কতকগুলি ক্ষুদ্র রোম আছে, তাহাতেও চক্ষুর অনেক রক্ষা হয়। ঐ রোমের নাম পক্ষ্ম। পক্ষ্ম আছে বলিয়া ধূলা, কুটা, কীট, প্রভৃতি চক্ষে পড়িতে পায় না এবং সূর্য্যের উত্তাপ অল্প লাগে।

চক্ষু না থাকিলে অত্যন্ত অসুখ ও অত্যন্ত ক্লেশ। যাহার দুই চক্ষু নাই সে অন্ধ। অন্ধ

কিছুই দেখিতে পায় না; কোথাও যাইতে পারে না; যাইতে হইলে এক জন তাহার হাত ধরিয়া লইয়া যায়; নতুবা পড়িয়া মরে। অতএব অন্ধ হওয়া বড় ক্লেশ। যাহার এক চক্ষু নাই তাহাকে কাণা কহে। কাণা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায়; কাণাকে অন্ধের মত দুঃখ ও ক্লেশ পাইতে হয় না।

চক্ষুর ঠিক মধ্য স্থলে যে এক অতি ক্ষুদ্র অংশ আছে উহা দর্পণের মত স্বচ্ছ। আমরা যে কোন বস্তু অবলোকন করি, ঐ স্বচ্ছ অংশে সেই সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে; সেই প্রতিবিম্ব এক শিরা দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হইলে দর্শন জ্ঞান জন্মে।

কর্ণ দ্বারা সকল শব্দের শ্রবণ হয়, এই নিমিত্ত কর্ণকে শ্রবণেন্দ্রিয় কহে। কর্ণ না থাকিলে আমরা কিছুই শুনিতে পাইতাম না। শব্দ সকল প্রথমতঃ কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। অভ্যন্তরে পটহের মত যে অতি পাতলা এক খণ্ড চর্ম্ম আছে, তাহাতে সেই শব্দের প্রতিঘাত হয়, এবং তাহাতেই শ্রবণ জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়।

কোন কোন লোক এমত দুর্ভাগ্য,যে, তাহাদিগের শ্রবণ শক্তি নাই; তাহারা বধির অর্থাৎ কালা। কেহ কিছু কহিলে অথবা কেহ কোন শব্দ করিলে কালারা শুনিতে পায় না।

নাসিকাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় কহে। নাসিকা দ্বারা গন্ধের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। নাসিকা না থাকিলে কি ভাল, কি মন্দ, কোন গন্ধ ঘ্রাণ করিতে পারিতাম না। নাসা রন্ধ্রের অভ্যন্তরে কতক গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সঞ্চারিত আছে; তাহা দ্বারাই পুষ্পের ও অন্য অন্য দ্রব্যের আঘ্রাণ পাওয়া যায়। যে সকল গন্ধের আঘ্রাণে মনের প্রীতি জন্মে তাহাকে সুগন্ধ ও সৌরভ কহে, আর যে গন্ধের আঘ্রাণে অসুখ ও ঘৃণা বোধ হয় তাহাকে দুর্গন্ধ কহে। আতর, চন্দন ও পুষ্পের গন্ধ সুগন্ধ; মলান বস্তু পচিলে যে গন্ধ হয় তাহা দুর্গন্ধ।

জিহ্বা দ্বারা সকল বস্তুর আস্বাদন পাওয়া যায়; এই নিমিত্ত জিহ্বাকে রসনেন্দ্রিয় কহে রসন শব্দের অর্থ আস্বাদন। জিহ্বার অন্য এক নাম রসনা। জিহ্বা না থাকিলে আমরা

কোন বস্তুরই আস্বাদন বুঝিতে পারিতাম না। জিহ্বার অগ্রভাগে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা সম্বদ্ধ আছে। মুখের মধ্যে কোন বস্তু দিবা মাত্র ঐ শিরা দ্বারা তাহার স্বাদগ্রহ হয়

বস্তুর আস্বাদন নানা প্রকার। চিনির আস্বাদ মধুর; তেঁতুল অম্ল বোধ হয়; নিম্ব ও চিরতা তিক্ত লাগে। যাহা খাইতে ভাল লাগে তাহাকে সুস্বাদ কহে; যাহা মন্দ লাগে তাহাকে বিস্বাদ কহে। কোন কোন বস্তুর কিছুই আস্বাদন নাই; মুখে দিলে, না অম্ল, না মধুর, না তিক্ত, না কটু, কিছুই বোধ হয় না; যেমন গঁদ, চোয়ান জল

ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক্ দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হয়। ত্বক্ সকল শরীর ব্যাপিয়া আছে; অতএব শরীরের সকল অংশেতেই স্পর্শ জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু সকল অঙ্গ অপেক্ষা হস্তই স্পর্শ জ্ঞানের প্রধান সাধন। অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা আছে তাহা দ্বারা অতি উত্তম স্পর্শ জ্ঞান হয়। অন্ধকারে যখন দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন হস্ত ও অন্য অন্য অঙ্গ

দ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রায় সকল বস্তুই জানিতে পারা যায়। বায়ু দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা উহার অনুভব হয়।

এই সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পথস্বরূপ। ইন্দ্রিয় পথ দ্বারা আমাদিগের মনে জ্ঞান সঞ্চার হয়। ইন্দ্রিয় বিহীন হইলে আমরা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকিতাম। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিনিয়োগ দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ হয়। অভিজ্ঞতা লাভ হইলে, ভাল, মন্দ, হিত, অহিত বিবেচনার শক্তি জন্মে। অতএব ইন্দ্রিয় মনুষ্যের অশেষ উপকারক।

মনুষ্যের ন্যায়, পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জীব জন্তুরও এই সকল ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু তাহাদিগের কোন কোন ইন্দ্রিয় মনুষ্যের অপেক্ষা অতি প্রবল। বিরালের শ্রবণ শক্তি অনেক অধিক। কোন কোন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক প্রবল। এরূপ হইবার তাৎপর্য্য এই যে, বিরালের শ্রবণশক্তি অধিক না থাকিলে, অন্ধকার স্থানে মূষিক প্রভৃতির সঞ্চার বুঝিতে পারিত না। এক প্রকার কুকুর আছে

তাহারা পলায়িত পশুর গাত্র গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া তাহার অন্বেষণ করিয়া লয়; ঘ্রাণ শক্তি এত অধিক না হইলে তাহারা শীকার করিতে পারিত না। বিরল অন্ধকার স্থানে বিরাল মনুষ্য অপেক্ষা অনেক ভাল দেখিতে পায়; কিন্তু যেখানে কিছুমাত্র আলোক নাই, ঘোর অন্ধকার, সে স্থলে বিরাল মনুষ্য অপেক্ষা অধিক দেখিতে পায় না।

এইরূপ যে জন্তুর যে ইন্দ্রিয়ের যেমন শক্তি আবশ্যক, ঈশ্বর তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তিনি কাহারও কোন বিষয়ে ন্যূনতা রাখেন নাই।

নানা বর্ণের বস্তু অবলোকন করিলে নয়নের যে রূপ প্রীতি জন্মে, সর্ব্বদা এক বর্ণের বস্তু দেখিলে সে রূপ হয় না, বরং বিরক্তিই জন্মে। এই নিমিত্ত জগদীশ্বর জগতের যাবতীয় পদার্থ এক বর্ণের না করিয়া নানা বর্ণের করিয়াছেন। সকল বর্ণ অপেক্ষা হরিত বর্ণ অধিক মনোরম ও অধিক ক্ষণ দেখিতে পারা যায়; এজন্য জগতে অন্য অন্য বর্ণের অপেক্ষা হরিত বর্ণের বস্তুই অধিক।

কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, উভয়বিধ পদার্থেই নানা প্রকার বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যেখানে যত বর্ণ আছে, সকলই তিনটী মাত্র মূল বর্ণ হইতে উৎপন্ন। সেই তিন মূল বর্ণ এই; নীল, পীত, লোহিত। এই তিন মূলীভূত বর্ণকে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে মিশ্রিত করা যায় তত প্রকার বর্ণ উৎপন্ন হয়। ঐ সকল উৎপন্ন বর্ণকে

মিশ্র বর্ণ কহে। মিশ্র বর্ণের মধ্যে হরিত, পাটল, ধূমল এই তিনটী প্রধান। নীল ও পীত এই দুই মূলবর্ণ মিশ্রিত করিলে হরিত বর্ণ উৎপন্ন হয়। পীত ও লোহিত এই দুই মিশ্রিত করিলে পাটল বর্ণ হয়। নীল ও লোহিত এই দুই বর্ণের মিলনে ধূমল বর্ণ হয়। তদ্ভিন্ন কপিশ, ধূসর, পিঙ্গল ইত্যাদি নানা মিশ্র বর্ণ আছে। সে সকলও ঐ তিন মূলীভূত বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

সর্ব্ব বর্ণের অভাব, অর্থাৎ যেখানে কোন বর্ণই নাই সেই শুক্ল বর্ণ। আর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারই কৃষ্ণ বর্ণ। ফলতঃ শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত নহে। কিন্তু জগতে শুক্ল ও কৃষ্ণ বস্তু অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বকপক্ষ ও কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত ধৌত বস্ত্র শুক্লের উত্তম উদাহরণ স্থল। রাত্রিকালীন প্রগাঢ় অন্ধকার কৃষ্ণ বর্ণের উত্তম দৃষ্টান্ত।

রামধনু ও ময়ূর পুচ্ছে এক কালে নানা বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন গগনমণ্ডলে ধনুকের মত নানা বর্ণের অতি সুন্দর যে বস্তু

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে লোকে রামধনু ও ইন্দ্রধনু বলে। কিন্তু সে কেবল কল্পনা মাত্র। উহা কাহারও ধনুক নহে। ধনুকের মত দেখায় এই নিমিত্ত লোকে ধনুক কহে। উহা আর কিছুই নয়, কেবল বৃষ্টিকালীন জলবিন্দু সমূহে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া ঐরূপ নানা বর্ণের পরম সুন্দর ধনুকের আকার উৎপন্ন হয়। রামধনুকে তিন মূলবর্ণ ও চারি মিশ্র বর্ণ, সমুদায়ে সাত বর্ণ থাকে। ধনুকের উপরি ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া যথা ক্রমে লোহিত, পাটল, পীত, হরিত নীল, ধূমল, বায়লেট এই সকল বর্ণ শোভা পায়।

মনুষ্যেরা মুখ দ্বারা শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব ও অভিপ্রায় প্রকাশ করে। ঐ সকল শব্দের উচ্চারণ বিষয়ে জিহ্বাই প্রধান সাধন। ঐরূপ শব্দ উচ্চারণ করাকেই কথা কহা বলে; এবং সেই উচ্চারিত শব্দের নাম ভাষা। যে শক্তি দ্বারা ঐরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারা যায় তাহাকে বাক্‌শক্তি কহে

পশু, পক্ষী ও অন্যান্য জন্তুদিগের বাক্‌শক্তি নাই। তাহাদিগের মনে কখন কখন কোন কোন ভাবের উদয় হয় বটে; কিন্তু উহারা তাহা কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না; কেবল এক প্রকার অব্যক্ত শব্দ ও চীৎকার মাত্র করে। মেষ, মহিষ, গো, গর্দ্দভ, কুকুর, বিরাল, ছাগল, পক্ষী, ভেক প্রভৃতি জন্তু সকল এক এক প্রকার পৃথক্ পৃথক্ শব্দ করে। ঐ সকল শব্দ দ্বারা তাহারা আপনাদের হর্ষ, বিষাদ, রোষ, অভি-

লাষ প্রভৃতি মনের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু সে সকল অব্যক্ত শব্দ; বুঝিতে পারা যায় না; এই নিমিত্তই ঐ সকল শব্দকে ভাষা কহে না। শুক প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষিকে শিখাইলে, উহারা মনুষ্যের ন্যায় স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে; কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারে না; যাহা শিখে তাহাই কেবল বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকে।

চিন্তা ও বাক্‌শক্তির অভাবে পশুপক্ষিদিগকে মনুষ্য অপেক্ষা অনেক হীন অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। তাহাদের কোথায় জন্ম, কত বয়স কি নাম, কাহার কি অবস্থা ইত্যাদি কোন বিষয় পরস্পর জানাইতে পারে না। সুতরাং তাহারা পরস্পরকে শিক্ষা দিতে অক্ষম এবং আপনাদিগকে সুখী ও স্বচ্ছন্দ করিবার নিমিত্ত কোন উপায় করিতেও সমর্থ নয়। ফলতঃ মনুষ্য ভিন্ন আর সমুদায় জীব জন্তুকেই চিরকাল এই হীন অবস্থায় থাকিতে হইবেক; এবং মনুষ্যেরা অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিতে পারিবেক।

ঈশ্বর মনুষ্যজাতিকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন;

তদ্ভিন্ন আমাদিগের চিন্তা শক্তিও আছে। মনে যাহা চিন্তা করি জিহ্বা দ্বারা তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। জিহ্বা ও কণ্ঠনালী এই উভয়কে বাগিন্দ্রিয় কহে। জিহ্বা দ্বারা উচ্চারণ সম্পন্ন হয়; কণ্ঠনালী দ্বারা শব্দ নির্গত হয়। কোন কোন লোক এমত হতভাগ্য যে কথা কহিতে পারে না। উহাদিগকে মূক অর্থাৎ বোবা কহে।

সকল ব্যক্তিই অতি শৈশবকালে কথা কহিতে শিখে। প্রথম কথা কহিতে শিখা সজাতীয় লোকের নিকটেই হয়; এই নিমিত্ত প্রথম শিক্ষিত ভাষাকে জাতিভাষা কহে।

সকলেরই স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা কহিতে চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। আর যখন যাহা কহিবে, সত্য বই মিথ্যা কহিবে না। মিথ্যা কহা বড় পাপ। মিথ্যা কহিলে কেহ বিশ্বাস করে না। সকলেই ঘৃণা করে। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনবান্, কি দরিদ্র, কাহারও অশ্লীল ও অসাধু ভাষা মুখে আনা উচিত নহে। কি ছোট, কি বড়, সকলকেই প্রিয় ও মিষ্ট বাক্য কহা উচিত;

রূঢ় ও কর্কশ বাক্য কহিয়া কাহারও মনে দুঃখ ও বেদনা দেওয়া উচিত নহে।

সকল দেশেরই ভাষা পৃথক্ পৃথক্; এই নিমিত্ত না শিখিলে এক দেশের লোক অন্য দেশীয় লোকের কথা বুঝিতে পারে না। আমরা যে ভাষা কহি তাহাকে বাঙ্গলা বলে; কাশী অঞ্চলের লোকে যে ভাষা কহে তাহাকে হিন্দী বলে; পারস্যদেশের লোকের ভাষা পারসী; আরব দেশের ভাষা আরবী। হিন্দী ভাষাতে আরবী কথা মিশ্রিত হইয়া যে এক ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে উর্দ্দু ও হিন্দুস্থানী বলে কিন্তু বিবেচনা করিলে, উর্দ্দুকে স্বতন্ত্র ভাষা বলা যাইতে পারে না। কতকগুলি আরবী ও পারসী কথা ভিন্ন উহা সর্ব্ব প্রকারেই হিন্দী; ইংলণ্ডীয় লোকের অর্থাৎ ইংরেজদিগের ভাষা ইংরেজী। ইংরেজেরা এক্ষণে আমাদের দেশের রাজা, সুতরাং ইংরেজী আমাদিগের রাজভাষা; এই নিমিত্ত সকলে আগ্রহ পূর্ব্বক ইংরেজী শিখে। কিন্তু অগ্রে জাতিভাষা না শিখিয়া পরের ভাষা শিখা কোন মতেই উচিত নহে।

পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে যে ভাষা প্রচলিত ছিল তাহার নাম সংস্কৃত। সংস্কৃত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট। ঐ ভাষা এখন আর চলিত ভাষা নয়। কিন্তু ইহাতে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ আছে। এক্ষণে ভারতবর্ষে যত ভাষা চলিত, সংস্কৃত প্রায় সকলেরই মূল স্বরূপ। সংস্কৃত ভাল না জানিলে এদেশের কোন ভাষাতেই উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।

কাল।

প্রভাত ও সন্ধ্যাকাল কাহাকে কহে তাহা সক্
লেই জানে। যখন আমরা শয্যা হইতে
উঠি, সূর্য্যের উদয় হয়, তাহাকে প্রভাত কহে।
আর যখন সূর্য্য অস্ত যায়, অন্ধকার হইতে
আরম্ভ হয়, তাহাকে সন্ধ্যাকাল বলে। প্রভাত
অবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যে সময় তাহাকে দিবা
ভাগ কহে। আর সন্ধ্যা অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত
যে সময় তাহাকে রাত্রি কহে। দিবা ভাগে
সকল জীব জন্তু জাগরিত থাকে ও আপন আপন
কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে। রাত্রিকালে সকলে আরাম
করে ও নিদ্রা যায়। দিবা ভাগের প্রথম ভাগকে
পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্য ভাগকে মধ্যাহ্ণ, ও শেষ ভাগকে
অপরাহ্ণ কহে।

দিবা ও রাত্রি এই দুয়ে এক দিবস হয়; অর্থাৎ
এক প্রভাত অবধি আর এক প্রভাত পর্য্যন্ত যে
সময় তাহাকে দিবস কহে। দিবসকে ষাটি ভাগ
করিলে ঐ এক এক ভাগকে এক এক দণ্ড কহে।

আড়াই দণ্ডে এক হোরা হয়। তিন হোরাতে অর্থাৎ সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর। দিন চারি প্রহর, রাত্রি চারি প্রহর। পনর দিবসে এক পক্ষ হয়। দুই পক্ষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ। যখন চন্দ্রের বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহাকে শুক্ল পক্ষ কহে; আর যখন চন্দ্রের ক্ষয় হইতে থাকে তাহাকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। দুই পক্ষে অর্থাৎ ত্রিশ দিনে এক মাস হয়

বার মাস। মাসের নাম এই; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র। দুই মাসে এক ঋতু হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, সমুদায়ে এই ছয় ঋতু। তন্মধ্যে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্ম ঋতু; আষাঢ়, শ্রাবণ বর্ষা; ভাদ্র, আশ্বিন শরৎ; কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ হেমন্ত; পৌষ, মাঘ শীত; ফাল্গুন, চৈত্র বসন্ত। বার মাসে অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে এক বৎসর হয়।

সচরাচর সকলে কহে, ত্রিশ দিনে এক মাস হয়; কিন্তু সকল মাস সমান হয় না; কোন কোন মাস ত্রিশ দিনে, কোন কোন মাস ঊন-

ত্রিশ দিনে, কোন কোন মাস একত্রিশ দিনে কোন কোন মাস বত্রিশ দিনে হয়। এই ন্যূনাধিক্য প্রযুক্তই বৎসরে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন হইয়া থাকে। সকল মাস ত্রিশ দিন হইলে ৩৬০ দিনে বৎসর হইত। পূর্ব্ব কালের লোকেরা ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা করিতেন; সেই অনুসারে অদ্যাপি সামান্য লোকে তিন শ ষাটি দিনে বৎসর কহে। মাসের শেষ দিবসকে সংক্রান্তি কহে। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে বৎসর সমাপ্ত হয়। বৈশাখ মাসের প্রথম দিবস নূতন বৎসর আরম্ভ। চির কালই বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে ও যাইতেছে। এইরূপ একশত বৎসরে এক শতাব্দী হয়।

কোন সুপ্রসিদ্ধ রাজার অধিকার, অথবা কোন সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, অবলম্বন করিয়া বৎসর গণনা হইয়া থাকে। এইরূপে যে বৎসর গণনা করা যায় তাহাকে শাক কহে। আমাদিগের দেশে দুই শাক প্রচলিত আছে, সংবৎ ও শকাব্দ। বিক্রমাদিত্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন; তিনি যে শাক প্রচলিত করিয়া

গিয়াছেন তাহার নাম সংবৎ। আর শালি-বাহন রাজা যাহা প্রচলিত করেন তাহার নাম শকাব্দাঃ। বিক্রমাদিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দী অতীত হইয়াছে; এক্ষণে বিংশ শতাব্দী চলিতেছে। এখন সংবৎ ১৯০৮, অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের সময় অবধি ১৯০৭ বৎসর গত হইয়াছে। এই রূপ শালিবাহনের সতর শতাব্দী অতীত হইয়াছে, অষ্টাদশ চলিতেছে; এক্ষণে শকাব্দাঃ ১৭৭৩। এই রূপ ইঙ্গরেজ, ফরাসী, জর্ম্মন্ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরা য়িশু খ্রীষ্টের জন্ম অবধি শাক গণনা করে; উহাকে খ্রীষ্টীয় শাক কহে; এক্ষণে খ্রীষ্টীয় শাক ১৮৫২। মুসলমানেরাও মহম্মদের মদীনা পলায়ন দিবস অবধি এক শাক গণনা করে; ঐ শাক এক্ষণে ১২৫৮ ইহার নাম সাল।

গণন—অঙ্ক।

বস্তুর সংখ্যা করিবার ও মূল্য কহিবার নিমিত্ত গণনা জানা অত্যন্ত আবশ্যক। সচরাচর সকলে কয়েকটী কথা দ্বারা গণনা করিয়া থাকে। সে কয়েকটী কথা এই ; এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ ছয়, সাত, আট, নয়, দশ। কিন্তু যখন পুস্তকে অথবা অন্য কোন স্থানে কেহ কোন বস্তুর সঙ্খ্যা পাত করে, তখন সে ব্যক্তি এক, দুই ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া তাহা অপেক্ষা সঙ্ক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করে ; অর্থাৎ, ঐ সকল শব্দ না লিখিয়া তাহার স্থানে এক এক অঙ্কপাত করে ; ঐ অঙ্ক দ্বারা সেই সেই শব্দের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

অঙ্ক সমুদায়ে দশটী মাত্র ; তাহাদের আকার ও নাম এই ;

১,	২,	৩,	৪,	৫,	৬,	৭,	৮,	৯,	০,
এক	দুই	তিন	চারি	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়	শূন্য

যেমন বর্ণমালার পঞ্চাশটী অক্ষরের পরস্পর যোজনা দ্বারা সকল বিষয় লিখিতে পারা যায়, সেইরূপ কেবল এই দশটী অঙ্কের পরস্পর যোগ, যত বড় হউক না কেন, সকল সঙ্খ্যাই লিখা যায়।

অন্তিম (০) অঙ্ককে শূন্য কহে, অর্থাৎ উহা কিছুই নয়; যেহেতু অন্য নয়টী অঙ্কের আশ্রয় ব্যতিরেকে কেবল উহার দ্বারা কোন সঙ্খ্যার বোধ হয় না। কিন্তু ১ এই অঙ্কের পর বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০ লিখিলে দশ হয়। ২ এই অঙ্কের পর বসাইলে (২০) কুড়ি হয়। ৩ এই অঙ্কের পর (৩০) ত্রিশ। ৪ এই অঙ্কের পর (৪০) চল্লিশ। ৫ এই অঙ্কের পর (৫০) পঞ্চাশ, ইত্যাদি। আর যদি ১ এই অঙ্কের পর দুই শূন্য বসান যায়, অর্থাৎ এইরূপ ১০০ লিখা যায় তবে তাহাতে এক শত বুঝায়। ১ লিখিয়া তিন শূন্য বসাইলে, অর্থাৎ এইরূপ ১০০০ লিখিলে সহস্র বুঝায়।

১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫ ইত্যাদি অঙ্ককে বিষম অঙ্ক কহে। আর ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৬ ইত্যাদি অঙ্ককে সম অঙ্ক কহে।

অঙ্ক ও শব্দ দ্বারা যেরূপে গণনা করা যায় তাহার প্রণালী নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :

১ এক	১৯ উনিশ	৩৭ সাঁইত্রিশ
২ দুই	২০ কুড়ি	৩৮ আটত্রিশ
৩ তিন	২১ একুশ	৩৯ উনচল্লিশ
৪ চারি	২২ বাইশ	৪০ চল্লিশ
৫ পাঁচ	২৩ তেইশ	৪১ একচল্লিশ
৬ ছয়	২৪ চব্বিশ	৪২ বিয়াল্লিশ
৭ সাত	২৫ পঁচিশ	৪৩ তিতাল্লিশ
৮ আট	২৬ ছাব্বিশ	৪৪ চুয়াল্লিশ
৯ নয়	২৭ সাতাশ	৪৫ পঁয়তাল্লিশ
১০ দশ	২৮ আটাশ	৪৬ ছচল্লিশ
১১ এগার	২৯ উনত্রিশ	৪৭ সাতচল্লিশ
১২ বার	৩০ ত্রিশ	৪৮ আটচল্লিশ
১৩ তের	৩১ একত্রিশ	৪৯ উনপঞ্চাশ
১৪ চৌদ্দ	৩২ বত্রিশ	৫০ পঞ্চাশ
১৫ পনর	৩৩ তেত্রিশ	৫১ একান্ন
১৬ ষোল	৩৪ চৌত্রিশ	৫২ বায়ন্ন
১৭ সতর	৩৫ পঁয়ত্রিশ	৫৩ তিপ্পান্ন
১৮ আঠার	৩৬ ছত্রিশ	৫৪ চুয়ান্ন

৫৫ পঞ্চান্ন	৭২ বায়াত্তর	৮৯ উননব্বই
৫৬ ছাপ্পান্ন	৭৩ তিয়াত্তর	৯০ নব্বই
৫৭ সাতান্ন	৭৪ চুয়াত্তর	৯১ একানব্বই
৫৮ আটান্ন	৭৫ পঁচাত্তর	৯২ বিরনব্বই
৫৯ উনষাটি	৭৬ ছিয়াত্তর	৯৩ তিরনব্বই
৬০ ষাটি	৭৭ সাতাত্তর	৯৪ চুরনব্বই
৬১ একষট্টি	৭৮ আটাত্তর	৯৫ পঁচানব্বই
৬২ বাষট্টি	৭৯ উনআশি	৯৬ ছিয়ানব্বই
৬৩ তিষট্টি	৮০ আশি	৯৭ সাতানব্বই
৬৪ চৌষট্টি	৮১ একাশি	৯৮ আটানব্বই
৬৫ পঁয়ষট্টি	৮২ বিরাশি	৯৯ নিরনব্বই
৬৬ ছষট্টি	৮৩ তিরাশি	১০০ শত
৬৭ সাতষট্টি	৮৪ চুরাশি	১০০০ সহস্র
৬৮ আটষট্টি	৮৫ পঁচাশি	১০০০০ অযুত
৬৯ উনসত্তর	৮৬ ছিয়াশি	১০০০০০ লক্ষ
৭০ সত্তর	৮৭ সাতাশি	১০০০০০০ নিযুত
৭১ একাত্তর	৮৮ অষ্টাশি	১০০০০০০০ কোটি

হা ভিন্ন অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, প্রভৃতি আরও তকগুলি সঙ্খ্যা আছে, এস্থলে তাহাদের উল্লেখ রা অনাবশ্যক।

১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি অঙ্ক যেমন সঙ্খ্যা-বাচক, সেইরূপ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পূরণ বাচকও হয়। যাহা দ্বারা সঙ্খ্যা পূর্ণ হয় তাহাকে পূরণবাচক অঙ্ক কহে। যদি দুটী রেখা।। লেখা যায় তবে শেষের টীকে দ্বিতীয় অর্থাৎ দুই সঙ্খ্যার পূরক বলিতে হই বেক, আর আগের টীকে প্রথম; কারণ শেষের রেখাটী না লিখিলে দুই সঙ্খ্যা পূর্ণ হয় না, এবং আগের রেখাটী না থাকিলে এক সংখ্যা সম্পন্ন হয় না। এইরূপ তিন রেখা।।। লিখিলে শেষের টীকে তৃতীয় অর্থাৎ তিন সংখ্যার পূরক বলিতে হইবেক; কারণ শেষের রেখাটী না থাকিলে তিন সংখ্যা পূর্ণ হয় না। এবং চারি রেখা।।।। লিখিলে শেষের টীকে চতুর্থ রেখা; পাঁচ রেখা ।।।।। লিখিলে শেষের টীকে পঞ্চম রেখা কহা যায়; কারণ শেষের দুইটী রেখা না থাকিলে চারি ও পাঁচ সংখ্যা পূর্ণ হয় না।

১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি অঙ্ক যখন পূরণার্থে লিখিত হয় তখন ঐ ঐ অঙ্কের শেষে প্রথম, দ্বিতীয়, ইত্যাদি পূরণ বাচক শব্দের শেষ অক্ষর

যোগ করিয়া দেওয়া উচিত; তাহা হইলে অর্থ প্রতীতির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। যেমন ১ম, ২য়, ৩য়, এই রূপ অক্ষর সংযোগ করিয়া লিখিলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, বুঝাইবেক; অক্ষর সংযোগ না করিলে এক, দুই, তিন; কি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়; ইহা স্পষ্ট বোধ হওয়া দুর্ঘট। যেহেতু যদি কেহ এরূপ লিখে "আমি চৈত্র মাসের ৩ দিবসে এই কর্ম্ম করিয়াছিলাম" তাহা হইলে তিন দিবসে, অথবা তৃতীয় দিবসে, কিছুই নিশ্চিত বুঝা যাইবেক না। কেহ এমত বুঝিবেক, ঐ কর্ম্ম করিতে তিন দিবস লাগিয়াছিল; কেহ বোধ করিবেক, তৃতীয় দিবসে ঐ কর্ম্ম করা হইয়াছিল। ফলতঃ যে লিখিয়াছিল তাহার অভিপ্রায় কি, নির্ণয় হওয়া কঠিন। কিন্তু ৩ এই অক্ষরের পরে যদি য় এই অক্ষর লেখা থাকে, তবে আর কোন সংশয় থাকে না, কেবল তৃতীয় বুঝায়।

পূরণবাচক অঙ্ক লিখিবার ধারা।

১ম	৯ম	১৭শ	২৫শ
প্রথম	নবম	সপ্তদশ	পঞ্চবিংশ
২য়	১০ম	১৮শ	২৬শ
দ্বিতীয়	দশম	অষ্টাদশ	ষড়্বিংশ
৩য়	১১শ	১৯শ	২৭শ
তৃতীয়	একাদশ	ঊনবিংশ	সপ্তবিংশ
৪র্থ	১২শ	২০শ	২৮শ
চতুর্থ	দ্বাদশ	বিংশ	অষ্টাবিংশ
৫ম	১৩শ	২১শ	২৯শ
পঞ্চম	ত্রয়োদশ	একবিংশ	ঊনত্রিংশ
৬ষ্ঠ	১৪শ	২২শ	৩০শ
ষষ্ঠ	চতুর্দ্দশ	দ্বাবিংশ	ত্রিংশ
৭ম	১৫শ	২৩শ	৩১শ
সপ্তম	পঞ্চদশ	ত্রয়োবিংশ	একত্রিংশ
৮ম	১৬শ	২৪শ	৩২শ
অষ্টম	ষোড়শ	চতুর্ব্বিংশ	দ্বাত্রিংশ

ইত্যাদি।

মাসের প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি দিবস বুঝাইতে হইলে, ১, ২ ইত্যাদি অঙ্কের পর পহিলা দোসরা ইত্যাদি শব্দের শেষ অক্ষর যোগ করিতে হয়। যথা

১লা	৯ই	১৭ই	২৫এ
পহিলা	নয়ই	সত্তরই	পঁচিশে
২রা	১০ই	১৮ই	২৬এ
দোসরা	দশই	আঠারই	ছাব্বিশে
৩রা	১১ই	১৯এ	২৭এ
তেসরা	এগারই	উনিশে	সাতাশে
৪ঠা	১২ই	২০এ	২৮এ
চৌঠা	বারই	বিশে	আটাশে
৫ই	১৩ই	২১এ	২৯এ
পাঁচই	তেরই	একুশে	উনত্রিশে
৬ই	১৪ই	২২এ	৩০এ
ছয়ই	চৌদ্দই	বাইশে	ত্রিশে
৭ই	১৫ই	২৩এ	৩১এ
সাতই	পনরই	তেইশে	একত্রিশে
৮ই	১৬ই	২৪এ	৩২এ
আটই	ষোলই	চব্বিশে	বত্রিশে

ক্রয় বিক্রয়—মুদ্রা।

যাহার যে বস্তু অধিক থাকে, সে সেই বস্তু বিক্রয় করে। আর যাহাদের অপ্রতুল থাকে তাহারা ক্রয় করে। লোকে মুদ্রা দিয়া বস্তু ক্রয় করিয়া থাকে। যদি মুদ্রা চলিত না থাকিত তাহা হইলে এক বস্তু দিয়া অন্য বস্তু বিনিময় করিয়া লইতে হইত। কিন্তু তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিত। কোন বস্তু ক্রয় করিতে হইলে যত মুদ্রা দিতে হয় উহাকে ঐ বস্তুর মূল্য কহে। বস্তুর মূল্য সকল সময়ে সমান থাকে না, কখন অধিক কখন অল্প হয়। যখন কোন বস্তু অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হয় তখন তাহাকে মহার্ঘ ও অক্রেয় কহে। আর যখন অল্পমূল্যে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় তখন তাহাকে সুলভ ও শস্তা কহে।

মুদ্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতুখণ্ড। স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র এই তিন প্রকার ধাতুতে মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। এই সকল ধাতু দুষ্প্রাপ্য, এই নিমি

ইহাতে মুদ্রা নির্ম্মাণ করে। দেশের রাজা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিরই মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার নাই। রাজাও স্বহস্তে মুদ্রা প্রস্তুত করেন না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রাজার লোক নিযুক্ত করা থাকে। রাজা স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্র ক্রয় করিয়া দেন। ঐ নিযুক্ত ভৃত্যেরা ইহাতে মুদ্রা প্রস্তুত করে। যে স্থানে মুদ্রা প্রস্তুত করা যায় তাহাকে টাকশাল কহে। কলিকাতা রাজধানীতে একটী টাকশাল আছে।

টাকশালের লোকেরা হস্তদ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করে না। মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তথায় নানা প্রকার কল আছে। টাকার উপর যে মুখ ও যে সকল অক্ষর মুদ্রিত থাকে তাহা ঐ কালে প্রস্তুত হয়। ঐ মুখ ও অক্ষর হস্ত দ্বারা নির্ম্মিত হইলে এমত পরিষ্কার হইত না। কোন্ রাজার অধিকারে কোন্ বৎসরে মুদ্রা প্রথম প্রস্তুত ও প্রচলিত হইল, এবং ঐ মুদ্রার মূল্য কত, ঐ সকল অক্ষরে তাহাই লিখিত থাকে। আর ঐ মুখও তৎকালীন রাজার মুখের প্রতিকৃতি।

সকল দেশেই নানা প্রকার মুদ্রা চলিত

আছে। আমাদের দেশে যে সকল মুদ্রা চলিত, তন্মধ্যে পয়সা তাম্রনির্ম্মিত; দুআনি, সিকি, আধুলি, টাকা রৌপ্যনির্ম্মিত; আর ঐরূপ সিকি, আধুলি, টাকা স্বর্ণনির্ম্মিতও আছে। স্বর্ণনির্ম্মিত টাকাকে সুবর্ণ ও মোহর কহে।

৪ পয়সায় ১ আনা; ৪ আনায় ১ সিকি;
২ সিকি, অথব ৮ আনায় ১ আধুলি;
২ আধুলি, অথবা ৪ সিকি, কিম্বা ১৬ আনায় ১ টাকা:
১৬ টাকায় ১ মোহর।

সিকি পয়সা অপেক্ষা অনেক ছোট; কিন্তু সিকির মূল্য পয়সা অপেক্ষা ষোল গুণ অধিক। ইহার কারণ এই যে, তাম্র অপেক্ষা রৌপ্য দুষ্প্রাপ্য, এজন্য রৌপ্যের মূল্য অধিক। স্বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য, এজন্য স্বর্ণের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এক সুবর্ণের অর্থাৎ মোহরের মূল্য ১৬ টাকা, অথবা ১০২৪ পয়সা। যদি মুদ্রা এরূপ দুষ্প্রাপ্য ও মহামূল্য না হইত, আর সকলেই অনায়াসে পাইতে পারিত, তাহা হইলে মুদ্রার এত গৌরব হইত না, এবং মুদ্রা লইয়া কেহ কোন বস্তু বিক্রয় করিত না। ফলতঃ

দুষ্প্রাপ্য হওয়াতেই মুদ্রার এত গৌরব ও মূল্য হইয়াছে।

কখন কখন মুদ্রার পরিবর্ত্তে নোট লওয়া যায়। নোট কেবল এক খণ্ড কাগজ। কতক গুলি ধনবান্ লোক একত্র হইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধার নিমিত্ত নোট প্রচলিত করে। লোকে তাহাদিগের উপর বিশ্বাস করিয়া টাকার পরিবর্ত্তে ঐ কাগজ লয়। ঐ ধনিরা ঐ টাকার দায়ী থাকে। ঐ সকল ধনী কেবল পরোপকারার্থে নোট প্রচলিত করে না, তাহাদিগেরও যথেষ্ট লাভ আছে। কত টাকার নোট তাহা ঐ নোটে লেখা থাকে। যে স্থানে টাকা পাওয়া দুষ্কর, অথবা যে খানে টাকা পাঠাইতে অসুবিধা ঘটে, এমত স্থলেই নোট বিশেষ আবশ্যক। নোট ব্যাঙ্কে প্রস্তুত হয়। কলিকাতায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নামে ঐ রূপ এক ব্যাঙ্ক আছে। ঐ ব্যাঙ্কের নোট বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানেই চলিত। লোকে নগদ টাকা আর ব্যাঙ্ক নোট দুই সমান জ্ঞান করে। ঐ ব্যাঙ্কে রাজার সম্পর্ক আছে এই নিমিত্ত উহার এত গৌরব।

বস্তুর আকার ও পরিমাণ।

সকল বস্তুরই আকার ভিন্ন ভিন্ন ; কোন কোন বস্তু বড় ও কোন কোন বস্তু ছোট। ঘটী অপেক্ষা কলসী বড় ; বিড়াল অপেক্ষা ঘোড় বড় ; শিশু অপেক্ষা যুবা বড়। সকল বস্তুরই আকারে দৈর্ঘ্য, বিস্তার, বেধ এই তিন গুণ আছে। বস্তুর লম্বা দিকের পরিমাণকে দৈর্ঘ্য কহে ; দুই পার্শ্বের পরিমাণকে বিস্তার, ও দুই পৃষ্ঠের পরিমাণকে বেধ কহে। কোন পুস্তকের উপরি ভাগ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য ; এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তার ; এক পৃষ্ঠ হইতে অপর পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত বেধ।

বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা যাইতে পারে ; আমরা কাপড়ের দৈর্ঘ্য মাপিতে পারি। এক স্থান হইতে অন্য স্থান কত দূর তাহাও মাপা যায় ; আমরা হস্ত দ্বারাই সকল বস্তু মাপিয়া থাকি। কনুই অবধি মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত এক হাত। সকলের হাত সমান নয়, এই নিমিত্ত,

হাতের নিরূপিত পরিমাণ আছে ; তাহা এইরূপ ; ৮ যবোদরে এক অঙ্গুল, ২৪ অঙ্গুলে ১ হাত। যবোদর শব্দে যবের মধ্যভাগ। আটটী যব সারি সারি রাখিলে উহাদের মধ্যভাগের যে পরিমাণ তাহাই অঙ্গুল। এইরূপ ২৪ অঙ্গুলে অর্থাৎ ১৯২ যবোদরে ১ হাত হয়। ৪ হাতে ১ ধনু, ২০০০ ধনুতে অর্থাৎ ৮০০০ হাতে এক ক্রোশ হয়, চারি ক্রোশে ১ যোজন।

লোকে বস্তুর দৈর্ঘ্য যে রূপে মাপে, বস্তুর উচ্চতাও সেই রূপে মাপা যায়। আমরা দেও-য়াল, খুটী, কপাট, বাড়ী, গাছ ইত্যাদির উচ্চতা মাপিতে পারি। উপরের দিকে যে দৈর্ঘ্য তাহাকে উচ্চতা কহে। এই রূপ কোন বস্তুর নীচের দিকে যে দৈর্ঘ্য তাহার নাম গভীরতা। দৈর্ঘ্য যে রূপে মাপা যায় গভীরতাও সেই রূপে মাপা যাইতে পারে। কোন কোন কূপের গভীরতা ১০, ১২ হাত ; কোন কোন পুষ্করিণীর গভীরতা ২০, ২৫ হাত।

কোন কোন বস্তু কোন কোন বস্তু অপেক্ষা অধিক ভারি। ক্ষুদ্র পুস্তক অপেক্ষা বৃহৎ পুস্তক

অধিক ভারি; সমান আকারের এক খণ্ড কাষ্ঠ অপেক্ষা এক খণ্ড লৌহ অধিক ভারি। অনেক বস্তু ওজনে বিক্রী হয়। বস্তুর ভারের পরিমাণকে ওজন কহে। সেই পরিমাণ এই প্রকার;

১ টাকার যত ভার তাহা ১ তোলা;

৫ তোলায় ১ ছটাক;

৪ ছটাকে ১ পোয়া;

৪ পোয়ায় ১ সের;

৪০ সেরে ১ মন।

যাহারা চিনি, লবণ, মিঠাই, সন্দেস ও এইরূপ আর আর দ্রব্য বিক্রয় করে তাহারা এই সকল পরিমাণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ধাতু

আমরা সর্ব্বদা যে সকল বস্তু ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশই ধাতুময়। থালা, ঘটী, বাটী, গাড়ু, ঘড়া, পিলসুজ, ছুরী, কাঁচী, ছুচ ইত্যাদি অনেক প্রকার বস্তু ও নানাবিধ অলঙ্কার, এই সমুদায় ধাতু নির্ম্মিত।

অন্য অন্য বস্তু অপেক্ষা ধাতুর ভার অধিক। ধাতু অতিশয় কঠিন; ঘা মারিলে সহসা ভাঙ্গে না; কিন্তু আগুনে গলান যায়। ধাতুকে পিটিয়া অতি পাতলা পাত ও সরু তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ধাতু এমত ভারসহ যে সরু তারে অতি ভারি বস্তু ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

ধাতু আকরে পাওয়া যায়। আকরে বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র দুই প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। ধাতু যখন স্বভাবতঃ নির্দ্দোষ হয় তাহাকে বিশুদ্ধ বলা যায়; আর যখন অন্য অন্য বস্তুর সহিত মিলিত থাকে তখন উহাকে বিমিশ্র কহে। স্বর্ণ,

রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, টিন এই কয়েক টী প্রধান ধাতু।

স্বর্ণ।

গলাইলে স্বর্ণের ভার কমিয়া যায় না ও বর্ণের বাত্যয় হয় না; এজন্য স্বর্ণকে উৎকৃষ্ট ধাতু কহে। স্বর্ণ জল অপেক্ষা উনিশ গুণ ভারি। এক সরিষা প্রমাণ স্বর্ণকে পিটিয়া দীর্ঘে ও প্রস্থে নয় অঙ্গুল পাত প্রস্তুত করা যাইতে পারে; এবং ঐ প্রমাণ স্বর্ণে ২৩৫ হাত তার প্রস্তুত হইতে পারে। স্বর্ণ এমত ভারসহ যে এক যবোদর মাত্র স্থূল তারে ৫ মন ৩৪ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

স্বর্ণ স্বভাবতঃ অতিশয় উজ্জ্বল ও সুশ্রী। ইহা মলিন হয় না; এ জন্য লোকে উহাতে অলঙ্কার গড়ায়। স্বর্ণেতে যে টাকা প্রস্তুত হয় তাহাকে মোহর কহে। স্বর্ণের মূল্য সর্ব্ব ধাতু অপেক্ষা অধিক। বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণ কাঁচা হরিদ্রার মত।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই স্বর্ণের আকর আছে; কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশেই অধিক।

রৌপ্য।

রৌপ্য জল অপেক্ষা প্রায় এগার গুণ ভারি। রৌপ্য শুক্ল ও উজ্জ্বল। স্বর্ণে যেমন পাতলা পাত ও সরু তার হয় ইহাতেও প্রায় সেই রূপ হইতে পারে। রৌপ্য এমত ভারসহ যে এক যবোদর স্থূল তারে ৪ মন ১১ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া পড়ে না।

পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই রূপার আকর আছে। কিন্তু আমেরিকা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

রূপাতে টাকা, আধুলি, সিকি, দু আনি নির্ম্মাণ করে। রূপাতে নানা প্রকার অলঙ্কার এবং ঘটী, বাটী প্রভৃতিও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

পারদ।

পারদ রৌপ্যের ন্যায় শুক্ল ও উজ্জ্বল। এই ধাতু জল অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দ গুণ ভারি। ইহা আর আর ধাতুর মত কঠিন নহে; জলের ন্যায় তরল। যাবতীয় দ্রব দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ভারি। সর্ব্বদা তরল অবস্থায় থাকে; কিন্তু মেরু সন্নিহিত দেশে লইয়া গেলে জমিয়া

যায়। তখন অন্য অন্য ধাতুর ন্যায় উহাতে সরু তার ও পাতলা পাত প্রস্তুত হইতে পারে এবং ঘা মারিলে সহসা ভাঙ্গিয়া যায় না।

পারা স্বভাবতঃ সমস্ত দ্রব দ্রব্য অপেক্ষা অধিক শীতল। কিন্তু আগুনের উত্তাপ দিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উষ্ণ হয়। অতি সহজেই পারাকে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঐ সকল খণ্ড গোলাকার হয়।

পারা জমাইয়া কাচের পাশ্চাৎ ভাগে বসাইয়া দিলে ঐ কাচে প্রতিবিম্ব পড়ে। ঐ রূপ কাচকে দর্পণ ও আরসী কহে। লোকে দর্পণে মুখ দেখে।

ভারতবর্ষ, চীন, তিব্বৎ, সিংহল, জাপান, স্পেন, অষ্ট্রিয়া, বাবেরিয়া, পেরু, মেক্সিকো এই সকল দেশে পারার আকর আছে।

সীস।

সীস সকল ধাতু অপেক্ষা নরম। জল অপেক্ষা এগার গুণ ভারি। সীসের ভার রৌপ্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। অন্য ধাতু অপেক্ষা ইহা অল্প উত্তাপে গলে। অত্যন্ত অধিক

উত্তাপ দিলে উড়িয়া যায়। জলে অথবা অনাবৃত স্থলে ফেলিয়া রাখিলে সীসের অধিক ভাব পরিবর্ত্ত হয় না; কেবল উপরের উজ্জ্বলতা মাত্র নষ্ট হইয়া যায়।

ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়লণ্ড, জর্ম্মনি, ফ্রান্স, ও আমেরিকা এই সকল দেশে অপর্য্যাপ্ত সীস জন্মে। হিমালয় পর্ব্বতে ও তিব্বৎ দেশেও সীসের আকর আছে।

সীস কাগজের উপর টানিলে ধূসর বর্ণ রেখা পড়ে। সীসেতে পেনসিল প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ সীসেতে গোলা গুলি নির্ম্মাণ করে। কিছু শক্ত ও উত্তম রূপে গোলাকার করিবার নিমিত্ত ইহাতে হরিতাল মিশাল দেয়। রসাঞ্জন মিশ্রিত করিলে সীসেতে ছাপিবার অক্ষর নির্ম্মিত হয়। টিন ও তামা মিশ্রিত করিলে উত্তম কাঁসা প্রস্তুত হয়।

তাম্র।

এই ধাতু জল অপেক্ষা আট গুণ ভারি। ইহা লাল বর্ণ, উজ্জ্বল ও দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাকে পিটিয়া যেমন পাত করা যায়, তার

তেমন হয় না। সকল ধাতু অপেক্ষা ইহা অতি গম্ভীর শব্দজনক। লৌহ অপেক্ষা অনেক সহজে গলান যায়। এক যবোদর স্থূল তারে ৩ মন ১৫ সের ভার ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যায় না।

তাম্রে পয়সা প্রস্তুত হয়। তামার পাত করিয়া জাহাজের তলা মুড়িয়া দেয়; তাহাতে জাহাজ শীঘ্র যায় ও শঙ্খ শম্বুক প্রভৃতি তলা ভেদ করিতে পারে না। অনেকে তামাতে পাকস্থালী ও জলপাত্র প্রস্তুত করে।

তিন ভাগ দস্তা ও এক ভাগ তামা মিশ্রিত করিলে পিত্তল হয়। পিতল দেখিতে অতি সুন্দর; অত্যন্ত প্রয়োজনে লাগে। তামায় যত শীঘ্র মরিচা ধরে পিতলে তত শীঘ্র নয়। পিতলে থালা, ঘটী, বাটী, কলসী ইত্যাদি নানা বস্তু প্রস্তুত করে।

সুইডন, সাক্সনি গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, পেরু, মেক্সিকো, চীন, জাপান, নেপাল, আগ্রা, আজমীর প্রভৃতি দেশে তাম্রের আকর আছে।

লৌহ

লৌহ সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক কার্য্যোপযোগী। এই ধাতুতে লাঙ্গলের ফাল, কোদাল, কাস্তয়া প্রভৃতি কৃষি কার্য্যের যন্ত্র সকল নির্ম্মাণ করে। ছুরী, কাঁচী, কুড়াল, খন্তা, কাটারি, চাবি, কুলুপ, শিকল, পেরেক, ছুঁচ, হাতা বেড়ী, কড়া, হাতুড়ি ইত্যাদি যে সকল বস্তু সর্ব্বদা প্রয়োজনে লাগে সে সমুদয় লৌহে নির্ম্মিত। ইহা ভিন্ন নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রও লৌহে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

লৌহ জল অপেক্ষা সাত আট গুণ ভারি। ইহা টিন ভিন্ন আর সকল ধাতু অপেক্ষা হালকী। লোহাতে মানুষের চুলের সমান সরু তার হইতে পারে। ইহা সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক ভারসহ; এক যবোদর স্থূল তারে ৬ মন ১৭ সের ভারি বস্তু ঝুলাইলেও ছিঁড়িয়া যাইবেক না।

লৌহ সকল ধাতু অপেক্ষা অধিক পাওয়া যায় এবং সকল দেশেই ইহার আকর আছে। কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইডেন, রুশিয়া এই কয়েক দেশে অধিক।

টিন।

টিন জল অপেক্ষা সাত গুণ ভারি। পূর্ব্বোক্ত সকল ধাতু অপেক্ষা লঘু, রূপা অপেক্ষা নরম, সীস অপেক্ষা কঠিন।

ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, চিলি, মেক্সিকো এবং বঙ্ক দ্বীপ এই কয়েক স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টিন জন্মে।

এই ধাতুতে বাক্স, পেটরা, কৌটা প্রভৃতি অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

যত প্রকার উৎকৃষ্ট প্রস্তর আছে হীরার জ্যোতিঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। হীরা আকরে জন্মে। পৃথিবীর প্রায় সকল প্রদেশেই হীরার আকর আছে। আকর হইতে তুলিবার সময় হীরা অতিশয় মলিন থাকে, এজন্য পরিষ্কার করিয়া লয়। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত বস্তু জানা গিয়াছে হীরা সর্ব্ব অপেক্ষা কঠিন; সুতরাং হীরার গুঁড়া ব্যতিরেকে আর কিছুতেই উহা পরিষ্কৃত করিতে পারা যায় না।

বিশুদ্ধ হীরক অতি পরিষ্কৃত জলের ন্যায় নির্ম্মল; সেইরূপ হীরাই অতি সুন্দর ও প্রশংসনীয়। তদ্ভিন্ন রক্ত, পীত, নীল, হরিত প্রভৃতি নানা বর্ণেরও হীরা আছে। বর্ণ ও রঙ যত গাঢ় হয়, হীরার মূল্য তত অধিক হয়। কিন্তু বর্ণহীন নির্ম্মল হীরা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য। আকার, বর্ণ ও নির্ম্মলতা অনুসারে মূল্যের তারতম্য হয়।

হীরার মূল্য এত অধিক, যে শুনিলে চমৎকার বোধ হয়। পোর্টুগালের রাজার নিকট এক

হীরা আছে তাহার মূল্য ৫৬৪৪৮০০০ পাঁচ কোটি চৌষট্টি লক্ষ আট চল্লিশ সহস্র টাকা নির্দিষ্ট আছে। আমাদিগের দেশে কোহিনুর নামে এক উৎকৃষ্ট হীরা ছিল। সচরাচর সকলে কহে তাহার মূল্য ৩৫০০০০০০ তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা; এক্ষণে এই মহামূল্য হীরা ইংলণ্ডে আছে।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে হীরা অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; ঔজ্জ্বল্য ব্যতিরিক্ত ইহার আর কোন গুণ নাই। কাচ কাটা বই আর কোন বিশেষ উপকারে আইসে না। অতএব, একরূপ এক খণ্ড প্রস্তর গৃহে রাখিবার নিমিত্ত, অনর্থ এত অর্থ ব্যয় করা কেবল মনের অহঙ্কার দেখান ও মূঢ়তা প্রকাশ মাত্র।

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, এই মহামূল্য মণি ও কয়লা দুই এক পদার্থ; কিছু দিন হইল, ডেপ্রে নামক এক ফরাসিদেশীয় পণ্ডিত, অনেক যত্ন, পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর, কয়লাতে হীরা প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব্বে কেহ কখন হীরা গলাইতে পারে নাই; কিন্তু তিনি বিদ্যাবলে ও বুদ্ধিকৌশলে তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কাচ

কাচ অতি কঠিন, নির্ম্মল ও মসৃণ পদার্থ এবং অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ অর্থাৎ অনায়াসে ভাঙ্গে। কাচ স্বচ্ছ, এই নিমিত্ত উহার মধ্য দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরের মধ্যে থাকিয়া জানালা ও কপাট বন্ধ করিলে অন্ধকার হয় এবং বাহিরের কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সারসী বন্ধ করিলে পূর্ব্বের মত আলো থাকে ও বাহিরের বস্তুও দেখা যায়। তাহার কারণ এই যে, সারসী কাচে নির্ম্মিত; সূর্য্যের আভা কাচ ভেদ করিয়া আসিতে পারে কিন্তু কাষ্ঠ ভেদ করিতে পারে না।

বালি ও এক প্রকার ক্ষার এই দুই বস্তু একত্র করিয়া অতিশয় অগ্নির উত্তাপ লাগাইলে উভয়ে মিশ্রিত হইয়া গলিয়া যায় এবং শীতল হইলেই কাচ হয়। বালি যত পরিষ্কার, কাচ সেই অনুসারে পরিষ্কার হয়। কাচে লাল, কাল, সবুজ, নীলদা প্রভৃতি রঙ্ করে, রঙ্ করিলে বড় সুন্দর দেখায়।

কাচ অনেক প্রয়োজনে লাগে। সারসি আরসি, সিসি, বোতল, গেলাস, ঝাড়, লণ্ঠন, চসমা, দূরবীক্ষণের মুকুর ইত্যাদি নানা বস্তু কাচে প্রস্তুত হয়।

কাচ কোন অস্ত্রে কাটা যায় না; কেবল হীরাতে কাটে। হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ কাচের উপর দিয়া টানিয়া গেলে একটী দাগ পড়ে; তার পর জোর দিলেই দাগে দাগে ভাঙ্গিয়া যায়। যদি হীরার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ স্বাভাবিক থাকে তবেই তাহাতে কাচ কাটা যায়। আর যদি হীরা ভাঙ্গিয়া অথবা আর কোন প্রকারে উহার অগ্র ভাগ সূক্ষ্ম করিয়া লওয়া যায়, তাহাতে কাচের গায়ে আঁচড় মাত্র লাগে, কাটিবার মত দাগ বসে না।

কাচ প্রস্তুত করিবার প্রণালী প্রথম কিরূপে প্রকাশিত হয় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তদ্বিষয়ে অনেকেই অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। প্লীনি নামে এক রোমীয় পণ্ডিত কহিয়াছেন ফিনিসিয়া দেশীয় কতকগুলি

বণিক্ জলপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিল। সিরিয়া দেশে উপস্থিত হইলে ঝড় তুফানে তাহাদিগকে সমুদ্রের তীরে লইয়া ফেলে। বণিকেরা তীরে উঠিয়া বালির উপর পাক করিতে আরম্ভ করিল। সমুদ্রের তীরে কালয় নামে এক প্রকার চারা গাছ ছিল; উহারি কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাহারা আগুন জ্বালিয়াছিল। বালি ও কালয়ের ক্ষার একত্র হওয়াতে অগ্নির উত্তাপে গলিয়া কাচ হইল। উহা দেখিয়া ঐ বণিকেরা কাচ প্রস্তুত করিতে শিখিল।

যেরূপে যে দেশে কাচের প্রথম উৎপত্তি হউক, উহা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে কাচের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিসর দেশেও তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কাচের ব্যবহার ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

উদ্ভিদ।

যে সকল বস্তু ভূমি, ক্ষেত্র, উদ্যান প্রভৃতি স্থানে জন্মে তাহাদিগকে উদ্ভিদ কহে; যেমন তৃণ, লতা, বৃক্ষ প্রভৃতি। উদ্ভিদ সকল যখন বাড়িতে থাকে তখন উহাদিগকে জীবিত বলা যায়; আর যখন শুকাইয়া যায়, আর বাড়ে না, তখন মৃত বলে। উদ্ভিদের জীবন আছে বটে, কিন্তু জন্তু-গণের ন্যায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে না। উহারা যেখানে জন্মে সেই খানেই থাকে; এই নিমিত্ত উহাদিগকে স্থাবর কহে।

উদ্ভিদ সকল মূল দ্বারা ভূমি হইতে রস আকর্ষণ করে; সেই আকৃষ্ট রস মূল হইতে স্কন্ধ দেশে উঠে; তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় শাখা, প্রশাখা ও পত্রে প্রবেশ করে। এইরূপে ভূমির রস উদ্ভিদের সর্ব্ব অবয়বে সঞ্চারিত হয়, তাহা-তেই উহারা জীবিত থাকে ও বাড়ে। উদ্ভিদ যদি সূর্য্যের উত্তাপ না পায় তাহা হইলে বা-

ড়িতে পারে না। শীত কালে রসের সঞ্চার রুদ্ধ হয় এই জন্য পত্র সকল শুষ্ক ও পতিত হয়। বসন্তকাল আগত হইলে পুনর্ব্বার রসের সঞ্চার আরম্ভ হয় তখন নূতন পত্র নির্গত হইতে থাকে।

বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি উদ্ভিদগণের সমুদায় অবয়ব ছালে আচ্ছাদিত। ছাল আছে বলিয়া উহাদিগকে আঘাত লাগে না এবং পুষ্টি বিষয়েও অনেক আনুকূল্য হয়। যদি ঐ ছাল অত্যন্ত আঘাত পায় তাহা হইলে উদ্ভিদ নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও শীঘ্র মরিয়া যায়।

প্রায় সমুদায় উদ্ভিদেরই ফলের মধ্যে বীজ জন্মে। সেই বীজ ভূমিতে বপন করিলে তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদ উদ্ভব হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ এরূপ আছে যে উহাদের শাখা অথবা মূলের কিয়দংশ ভূমিতে রোপণ করিয়া দিলে নূতন উদ্ভিদ জন্মায়।

যে সকল উদ্ভিদ ফল পাকিলেই শুষ্ক ও জীবনহীন হয় উহাদিগকে ওষধি কহে; যেমন ধান্য, কলায়, যব ইত্যাদি। লোকে নিয়মিত

কালে ভূমি খনন করিয়া ধান্য প্রভৃতির বীজ বপন করে। সেই বীজ হইতে গাছ জন্মে। পরে কালক্রমে ফল জন্মে। সেই সকল ফল পাকিয়া উঠিলেই গাছ শুকাইয়া যায়। অনন্তর সেই সকল গাছ কাটিয়া আনিয়া গাছ হইতে ফল পৃথক্ করিয়া লয়। এইরূপ ভূমিখনন বীজ বপন প্রভৃতি ক্রিয়াকে কৃষিকর্ম্ম কহে। কৃষি-কর্ম্ম দ্বারা যে সমস্ত ফল লাভ হয় উহাদিগকে শস্য বলে।

আমরা প্রতিদিন যাহা আহার করি তাহার অধিকাংশ সামগ্রীই কৃষিকর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন। কৃষি দ্বারা ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ শস্য জন্মে। তন্মধ্যে ধান্য হইতে তণ্ডুল, যব হইতে ছাতু, গম হইতে ময়দা; মুগ, মসূর, মাষ, মটর, অর-হর, ছোলা প্রভৃতি কলায় হইতে দ্বিদল জন্মে। তিল, সর্ষপ প্রভৃতি কতকগুলি শস্য আছে তাহা হইতে তৈল পাওয়া যায়। ইক্ষু হইতে গুড়, চিনি, মিছরি হয়। শাক, পটল, আলু, মূলা, লাউ, কুমড়া, ফুটী,, তরমুজ, ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রীও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়।

আম, কাঁটাল, জাম, আতা, পেয়ারা, বাদাম, কিসমিস্, দাড়িম, নারিকেল, ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্ট ও সুস্বাদ ফল বৃক্ষ হইতে জন্মে। যেখানে এই সকল ফলের বৃক্ষ অনেক থাকে তাহাকে উপবন, উদ্যান ও বাগান কহে।

কৃষিকর্ম্ম দ্বারা কার্পাস জন্মে। কার্পাস এক প্রকার শস্য। কার্পাসের বীজ পৃথক্ করিলেই তুলা হয়; তুলা হইতে সূত্র। তন্তুবায়েরা সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে; আমরা সেই বস্ত্র পরিধান করি। অতএব আমাদিগের পরিধান বস্ত্রও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা লব্ধ হয়।

জল—সমুদ্র—নদী

জল অতি তরল বস্তু; স্রোত বহিয়া যায় এবং এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালিতে পারা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ জলে মগ্ন। যে জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে তাহার নাম সমুদ্র। সমুদ্রের জল অতিশয় লোণা ও এমত বিস্বাদ যে কেহ পান করিতে পারে না।

সমুদ্রের জল সকল স্থানে সমান লোণা নহে; কোন স্থানে অল্প লোণা, কোন স্থানে অধিক। সমুদ্রের জলের উপরি ভাগে বৃষ্টি ও নদীর জল মিশ্রিত হয় এই জন্যে ভিতরের জল যত লোণা উপরের জল তত নয়। উত্তর সমুদ্র অপেক্ষা দক্ষিণ সমুদ্রের জল অধিক লোণা।

সমুদ্রের জল লোণা হইল কেন এ বিষয়ে অনেকে অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কিছুই উত্তম রূপে স্থির করিতে পারেন নাই। এই মাত্র স্থির বলিতে পারা যায়, ঈশ্বর সমুদ্রের জল লোণা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই

অবধি চিরকাল লোণা আছে ও চিরকাল এই রূপ লোণা থাকিবেক।

অল্প পরিমাণে সমুদ্রের জল লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহার কোন রঙ নাই। কিন্তু সমুদ্রের রাশীকৃত জল নীলবর্ণ দেখায়। নীলবর্ণ দেখায় কেন, তাহার কারণ এপর্যান্ত স্থির হয় নাই।

সমুদ্র কত গভীর তাহার নিশ্চয় হয় নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চিত বটে গভীরতা সকল স্থানে সমান নয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, যে স্থানে অত্যন্ত গভীর সে খানেও আড়াই ক্রোশের বড় অধিক হইবেক না। অনেকে সমুদ্রের তল মাপিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ ৩১২০ হাত, কেহ ৪৮০০ হাত, কেহ ১৮৫০০ হাত লম্বা মানরজ্জু সমুদ্রে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রজ্জুই তল স্পর্শ করিতে পারে নাই; সুতরাং সমুদ্রের জলের ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। লাপ্লাস নামক এক ফরাসিদেশীয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত কহিয়াছেন, এক্ষণে সমুদ্রের যত জল আছে যদি আর তাহার চতুর্থ ভাগ অধিক হয়, তবে সমুদায়

পৃথিবী জলপ্লাবিত হইয়া যায়; আর যদি তাহার চতুর্থ ভাগ কম হয়, তাহা হইলে সমুদায় নদী খাল প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

যথা নিয়মে প্রতি দিন সমুদ্রের জলের যে হ্রাস বৃদ্ধি হয় তাহাকে জোয়ার ভাটা বলে: অর্থাৎ সমুদ্রের জল যে সহসা স্ফীত হইয়া উঠে তাহাকে জোয়ার কহে; আর ঐ জল পুনরায় যে ক্রমে ক্রমে অল্প হইতে থাকে তাহাকে ভাটা কহে। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে এই অদ্ভুত ঘটনা হয়।

লোকে জাহাজে চড়িয়া, সমুদ্রের উপর দিয়া, এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায়। যদি জাহাজ ঝড় ও তুফানে পড়ে, অথবা পাহাড়ে কিম্বা চড়ায় লাগে, তাহা হইলে বড় বিপদ্; জাহাজের সমুদায় লোকেরই প্রাণ নষ্ট হইতে পারে।

সমুদ্র এমত বিস্তৃত যে কতক দূর গেলে পর আর তীর দেখা যায় না; অথচ জাহাজের লোক পথ হারা হয় না। তাহার কারণ এই যে, জাহাজে কোম্পাস নামে একটী যন্ত্র থাকে; ঐ যন্ত্রে একটী সূচী আছে; জাহাজ যে মুখে যাউক না

কেন, সেই সূচী সর্ব্বদাই উত্তর মুখে থাকে। উহা দেখিয়া নাবিকেরা দিক্ নির্ণয় করে।

প্রাতঃকালে যে দিকে সূর্য্য উদয় হয় তাহাকে পূর্ব্ব দিক্ কহে। যে দিকে সূর্য্য অস্ত যায় তাহাকে পশ্চিম দিক্ কহে। পূর্ব্ব দিকে ডানি হাত করিয়া দাঁড়াইলে, সম্মুখে উত্তর ও পশ্চাতে দক্ষিণ দিক্ হয়। এই পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ বিবেচনা করিয়া লোকে, কি স্থলপথে কি জলপথে, পৃথিবীর সকল স্থানেই যাতায়াত করে।

নদীর ও অন্যান্য স্রোতের জল সুস্বাদ, সমুদ্রের জলের ন্যায় বিস্বাদ ও লবণময় নহে। যাবতীয় নদীর উৎপত্তি স্থান প্রস্রবণ। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড় বড় নদী আছে সকলেরই এক এক প্রস্রবণ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হয়; এজন্য ঐ সময়ে সকল নদীরই প্রবাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সমুদয় প্রধান প্রধান নদীর জল সমুদ্রে পড়ে। কিন্তু তাহাতে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হয় না। যেহেতু নদীপাত দ্বারা সমুদ্রের যত জল

বাড়ে, সেই পরিমাণে সমুদ্রের জল সর্ব্বদাই কুজ্ঝটিকা ও বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিতেছে। ঐ সমস্ত বাষ্পে মেঘ হয়। মেঘ সকল যথা-কালে জল হইয়া ভূতলে পতিত হয়। সেই জল দ্বারা পুনর্ব্বার নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি হয়।

সমুদ্রে ও নদীতে নানা প্রকার জলজন্তু ও মৎস্য আছে। জালিয়েরা জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিয়া আনে এবং সেই সকল মৎস্য বিক্রয় করিয়া আপনাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পরিশ্রম—অধিনা।

আমরা চারি দিকে যে সকল বস্তু দেখিতে পাই ঐ সকল বস্তু অবশ্যই কোন না কোন লোকের হইবেক। যে বস্তু যাহার সে ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া উহা উপার্জ্জন করিয়াছে। বিনা পরি শ্রমে কেহ কোন বস্তু লাভ করিতে পারে না। ভিক্ষা করিলে পরিশ্রম ব্যতিরেকে লাভ হইতে পারে; কিন্তু ভিক্ষা করা ভদ্র লোকের কর্ম্ম নয়। যে ভিক্ষা করে সে অত্যন্ত নিস্তেজঃ ও নীচাশয়। তাহাকে সকলে ঘৃণা করে।

যদি কোন ব্যক্তি কখন পরিশ্রম না করিত, তাহা হইলে গৃহনির্ম্মাণ ও কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত না। আহার সামগ্রী, পরিধান বস্ত্র, ও পড়িবার পুস্তক, কিছুই পাওয়া যাইত না। সকল সংসার দুঃখে কাল যাপন করিত। পৃথিবী যে রূপ সুখের স্থান হইয়াছে এরূপ কদাচ হইত না।

পরিশ্রম না করিলে কেহ কখন ধনবান্ হইতে পারে না। কেহ কেহ পৈতৃক বিষয় পাইয়া ধনবান্ হয় যথার্থ বটে; কিন্তু তাহারা পরিশ্রম না করুক, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অর্থাৎ পিতা অথবা পিতামহ পরিশ্রম করিয়া ঐ ধন উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ অনায়াসে ধনলাভ হওয়া অল্প লোকের ঘটে; সুতরাং সেই কয়েক জন ভিন্ন সকল লোককেই পরিশ্রম করিতে হইবেক।

লোকে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। অর্থ না হইলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। অন্ন, বস্ত্র, গৃহ ও অন্য অন্য সমুদায় বস্তু অর্থসাধ্য। যদি অতঃপর আর কেহ পরিশ্রম না করে, তবে যে সকল আহারসামগ্রী প্রস্তুত আছে, অল্প কালের মধ্যেই তাহা ফুরাইয়া যাইবেক; সমুদায় বস্ত্র ক্রমে ক্রমে ছিন্ন হইবেক; এবং আর আর যে সকল বস্তু আছে সমস্তই কালক্রমে লোপ হইবেক। তাহা হইলেই সমুদায় লোককে অনাহারে নানা কষ্ট পাইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক।

বালকেরা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ নহে। তাহারা যত দিন কর্ম্মক্ষম না হয়, পিতা মাতা তাহাদিগের প্রতিপালন করেন। অতএব পিতা মাতা যখন বৃদ্ধ হইয়া কর্ম্ম করিতে অক্ষম হন তখন তাঁহাদের প্রতিপালন করা পুত্রদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; না করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম হয়।

বালকগণের উচিত বাল্য কাল অবধি পরিশ্রম করিতে অভ্যাস করে; তাহা হইলে বড় হইয়া অনায়াসে কর্ম্ম কাজ করিতে পারিবেক। স্বয়ং অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবেক না ও বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন করিতেও সমর্থ হইবেক। কোন কোন বালক এমত হতভাগ্য যে সর্ব্বদা অলস হইয়া সময় নষ্ট করিতে ভাল বাসে। পরিশ্রম করিতে হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। তাহারা বাল্য কালে বিদ্যাভ্যাস ও বড় হইয়া ধনোপার্জ্জন কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং যাবৎ জীবন ক্লেশ পায় এবং চির-কাল পরের গলগ্রহ হইয়া থাকে।

কোন ব্যক্তি পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন

করে অথবা অন্যের দত্ত যাহা প্রাপ্ত হয় সে বস্তু তাহার ; সে ভিন্ন অন্যের তাহা লইবার অধিকার নাই। যে বস্তু যাহার তাহা তাহারই থাকা উচিত। কারণ লোকে জানে, আমি পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিব তাহা আমারই থাকিবেক, অন্যে লইতে পারিবেক না. এই জন্যই তাহার পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু যদি জানিত আমার পরিশ্রমের ধন অন্যে লইবেক, তাহা হইলে সে কখন পরিশ্রম করিত না।

যদি কেহ অন্যের বস্তু লইতে বাঞ্ছা করে, ঐ বস্তু তাহার নিকট চাহিয়া অথবা কিনিয়া লওয়া উচিত; অজ্ঞাতসারে, অথবা বলপূর্ব্বক, কিম্বা প্রতারণা করিয়া লওয়া অনুচিত। এরূপ করিয়া লইলে অপহরণ করা হয়। সকল শাস্ত্রেই চুরি করিতে নিষেধ আছে। চুরি করা বড় পাপ। দেখ ধরা পড়িলে চোরকে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। তাহার কত অপমান; সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে ; চোর বলিয়া কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না; কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতেও চাহে না। অতএব প্রাণান্তেও পরের

দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত নহে। যদি কাহারও কোন দ্রব্য হারায় তাহা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া উচিত। আপনার হইল মনে করিয়া লুকাইয়া রাখিলে চুরি করা হয়।

কতক গুলি সাধারণ বস্তু আছে তাহাতে সকল লোকেরই সমান অধিকার; সকলেই বিনা পরিশ্রমে পাইয়া থাকে। বায়ু, সূর্য্যের আলোক, বৃষ্টি, নদীর জল এই সমস্ত ও এই রূপ আর আর বস্তু সকলেই সমান ভোগ করে। ইহা ভিন্ন আর কোন বস্তু লাভ করিবার বাঞ্ছা করিলে অবশ্যই পরিশ্রম করিতে হইবেক; বিনা পরিশ্রমে তাহা পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সম্পূর্ণ